বিশ্বাসের স্বর্গ , যুক্তির সত্য

অ নি রু দ্ধ আ হ মে দ

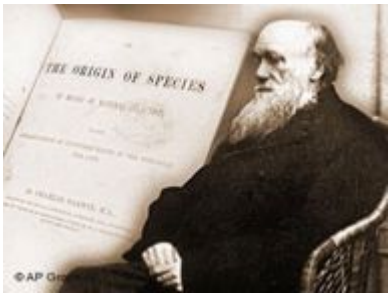

ফেব্রুয়ারী ২২, ২০০৬

সেই যে পুরোনো প্রবাদতুল্য উ”চারণ , বিশ্বাসে স্বর্গ মেলে , তর্কে বহুদুর সেই প্রবাদ প্রযোজ্য কেবল স্বর্গ সন্ধানের জন্যে ; যা কিছু পারলৌকিক এবং অলৌকিক ও বটে তার নাগাল পাওয়ার জন্যে তর্ক নয় , বিশ্বাসই যে যথেষ্ট সে কথাই বলা হয়েছে এই প্রবাদে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রই যে কোন যুক্তি তর্ককে খন্ডন করে দেন বাহ্যত এই আপ্ত বাক্য প্রয়োগ করে। আর সেখানেই ইহলৌকিক কার্যকারণ সম্স্লর্কের সঙ্গে ধর্মতাত্বিক চিন্ত্মার একটা প্রায় অবশ্যম্ভাবী বি”ছদ ঘটে যায়। এই বিভাজনটাই যুক্তিসম্মত । যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে যে কোন সমীকরণ সাধিত হতে পারে না , বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন যুক্তি এবং যুক্তির ভিত্তিতে কোন বিশ্বাস যে স্থাপন করা সম্ভব নয় সেটি বিশ্বে যত বেশী করে উ”চারিত হবে , ততই ইহলৌকিকতা ও পরলৌকিকতার মধ্যে পার্থক্যটা স্স্লষ্ট হয়ে উঠবে । এই পার্থক্যের প্রয়োজন রয়েছে , সংশিস্নষ্ট সকলের অধিকার সংরড়্গণ করার জন্যে । আর বিশ্বাস করা বা না করার একটা গণতান্ি¿ক অধিকার মানুষেরতো আছেই । অবিশ্বাসীরা নিশ্চিত নরকে নিড়্গিপ্ত হবে , এই উ”চারণটা ও নিতান্ত্মই বিশ্বাসের ব্যাপার এবং সেই কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করেন , তা হলে সেটা মানবার কোন রকম জোর জবরদস্তিত্মমুলক বাধ্যবাধকতামুলক থাকার কথা নয় , তাঁর । প্রকৃতপড়্গে দ্বন্দ্ব তখন দেখা দেয় , যখন মানুষ তাঁর বিশ্বাসকে যুক্তির প্রলেপ দিয়ে বোঝাতে চায় এবং বলতে চায় যে তার বিশ্বাসগুলো অন্ধ নয়। কোন কোন বিশ্বাস নিঃসন্দেহেই যুক্তি নির্ভর হতে পারে , যেমন সমাজের কিছু নৈতিক সত্য কিন্তু যখন এই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয় পারলৌকিকতা আর সেটি যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন , মোলস্না-পুরস্নত-পাদ্রীরা তখন বিস্মিত হতে হয়। ধর্ম সেখানে পরাস্ত্ম হয় যুক্তির ড়্গুরধার অস্ে¿র কাছে , আর যুক্তি ও অবমাণিত হয় ধর্মের বর্মের মুখোমুখি হয়ে। অতএব এ দুটির পথ ভিন্ন , একে সংমিশ্রণের কোন প্রচেষ্টাই সমর্থনযোগ্য নয়। সম্ভবত বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এক

ধরণের আপোষ রফা করার যে চেষ্টা করা হয়েছিল , ভিক্টোরীয় যুগে , যাকে বুদ্ধিজীবিরা ভিক্টোরিয়ান কম্প্রোমাইজ বলেন তারই ধারাবাহিকতায় এখন ও অনেকে এ দুয়ের মধ্যে এক ধরণের কষ্টকল্পিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন । এই চেষ্টার আরেকটি কারণ এ ও যে যাঁরা প্রচন্ড রকমের ধার্মিক , তাঁরা যে বিজ্ঞানমনস্কও সে কথা প্রমাণ করার জন্যে তাঁরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থর মধ্যেই , বৈজ্ঞানিক উপাদানের প্রতীকি বর্ণনা সন্ধান করেন আবার যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করেন , তাঁরা যে ধার্মিক সে কথা বোঝানোর জন্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের একটা যোগসুত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই দ্বিমুখী প্রয়াস বস্তুত ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ের জন্যেই সমস্যার সৃষ্টি করে কারণ এ দুটি শাস্ে¿র পথ সম্পুর্ণ ভিন্ন ।

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের একটা স্পষ্ট পার্থক্য যে মণিষী নির্দেশ করে গেছেন উনিশ শতকে , তিনি চার্লস ডারউইন। তাঁরই জন্ম জয়ন্তী উপলড়্গে এই তো মাত্র দিন কয়েক আগে, ১২ই ফেব্রুয়ারী পালিত হলো "ডারউইন দিবস।" বিশ্বের যুক্তিবাদী কিছু মানুষ যাঁদের দায়বদ্ধতা বিশেষ কোন সমাজ , সম্প্রদায় , জাতি বা ধর্মের প্রতি নয় , যাঁদের দায়বদ্ধতা গোটা মানবজাতির প্রতি , তাঁদের উদযোগেই এই ডারউইন দিবস পালিত হয়েছে, বোধ করি , আমাদের রুদ্ধদ্বার ভাবনাকে আরো মুক্ত করে দেয়ার এক অলিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে । চার্লস ডারউইনের জন্ম দিবস পালনের কোন আনুষ্ঠানিকতার কারণে নয় বরঞ্চ ডারউন যে আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনে বিপস্নব এনেছিলেন তাঁর বিবর্তনবাদের তত্ব দিয়ে সে কথাকে আবার স্মরণ করার জন্যে এবং তারই হাত ধরে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর এক স্পষ্ট অভিলাস লড়্গ্য করা যায় ডারউইন দিবস পালনের মধ্যে।

ডারউইন যে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন তার মধ্যে সব চেয়ে আলোচিত গ্রন্থটি হ'ছে ১৮৫৯ সালে লন্ডনে প্রকাশিত তাঁর অন দ্য *ওরিজিন অফ স্পিশিস* , যেখানে তিনি নেচারাল সিলেকশানের কথা বলেছেন, বলেছেন যোগ্যতমের টিকে থাকার কথা। সর্বোপরি যে সুত্র ধরে এগিয়ে এসছে বিবর্তনবাদ সেটি বিজ্ঞানের বিশ্বেতো বটেই , দর্শনের ড়্গেত্রে ও এনেছে এক বৈপস্নবিক পরিবর্তন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে বিতর্ক চলেছে বহু দিন ধরে , বাঁদর থেকে মানুষের রূপান্তরণ বিষয়ে আহত বোধ করেছেন অনেকেই , যাঁরা বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্বে বিশ্বাস করেছেন তাঁরা যেমন বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন তেমনি অনেক সাধারণ মানুষ ও তাঁদের অহম বোধে এক রকম আঘাত পেয়েছেন ডারউইনের সেই সব তত্বে। ডারউইন নিজেও একজন ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে বিগেল জাহাজে করে দড়্গিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে ডারউইন যে ব্রাজিলের বন দেখে মুগ্ধ হননি তা নয় , রবীন্দ্রনাথের মতোই বোধ করি ডারউইন ও বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে সন্ধান করেছেন সীমার মাঝের কোন অসীম অস্তিত্বকে কিন্তু

তার পর তাঁর যৌক্তিক অনুসন্ধান , তাঁর গবেষনায় ঋদ্ধ মন তাঁকে নিয়ে গেছে প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্রের পেছনে একটি কার্যকারণ সম্স্লর্ক আবিস্কারের দিকে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ প্রাণী থেকে মানুষের এই বিবর্তন যা অযুত কোটি বছরের ইতিহাস তুলে ধরেছে বিশ্ববাসীর কাছে তা তত্ত্বেও বিবর্তন হলেও , বিপস্নব ও বোধ করি এক ধরণের। ডারউইনের এই বৈপস্নবাত্মক বিবর্তনবাদ কট্টর খ্রীষ্টবাদী বিশ্বে সমাদৃত হয়নি তবে আমাদের সৌভাগ্য যে ডারউইনের তত্ত্বের সমালোচনা সত্ত্বেও কোন ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান ডারউইনের প্রাণ সংহার করার কোন হুমকি দেননি , ডারউইন নির্বাসিত ও হননি নিজ দেশ থেকে। পরের দিকে সেই এক ভিক্টোরীয় আপোষের অংশ হিসেবেই ডারউইনের তত্ত্বের বিপরীতে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের তত্ত্বও এসছে । সেখানে সরাসরি কোন ঈশ্বরের কথা উ"চারিত হয়নি বরঞ্চ বিজ্ঞানের মোড়কেই উপস্থাপিত করা হয়েছে এমন কোন শক্তিকে যাঁর পরিকল্পিত নকশা হিসেবেই এসছে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি। এই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রসঙ্গে ডার্উইন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন ,

> " *The Old argument of design by nature, as given by Paley, which formerly seem to me so conclusive, fails, now that the law of natural selection has been discovered. ....There seems to be no more design in the variability of organic beings and in the action of natural selection, than in the course the wind blows."*

ডারউইনের এই স্স্লষ্ট উ"চারণ খ্রীষ্ট জগতে একটা মস্তবড়ো তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল নিঃসন্দেহেই কিন্তু সেই রেনেসাঁসের ধারাবাহিকতায় ভিক্টোরীয় যুগেও যে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার একটা যৌক্তিক মানস বিরাজ করছিল , সেই কারণেই বিজ্ঞানকে ধর্মের সামনে কোন রকম জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এ নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা চলেছে , চলছে এখনও । বোধ করি ডারউইন নিজেও চাননি যে তাঁর তত্ত্ব , আরেকটি ধর্মতত্ত্বে পরিণত হোক , কারণ বিজ্ঞানের ধর্ম যে সম্স্লূর্ণ ভিন্ন সেটি ডারউইন জানতেন ভালোই। আমাদের সৌভাগ্য যে ডারউইনের জন্ম পশ্চিমের একটি যুক্তিবাদী সমাজে যেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরম্নদ্ধে কেবল ভিন্ন মতই প্রকাশিত হয় , খড়গ-তলোয়ার-ক্রুশ নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেনা প্রাণসংহারের হুমকি নিয়ে। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা ক্রমশই একটি অসহিষ্ণু বিশ্বের দিকে এগু"ছি যেখানে আমরা পরস্স্লরের অভিমত ও বিশ্বাসের সমালোচনা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ছি । আমাদের এই নিত্য মানসিক দৈন্যের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্স্লৃতি উদযাপিত ডারউইন দিবসের সার্থকতা চলে আসে। প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের তত্ত্ব কতটা ভুল বা নির্ভুল সে ব্যাখ্যা বিশেস্নষণ , প্রমাণ অপ্রমাণের দায়িত্ব বিজ্ঞানের ।

আমাদের জন্যে যেটি সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য তা হলো , আমাদের বর্তমান সমাজ ও চিন্ত্মা চেতনার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার লড়্গাযোগ্য অভাব। বিজ্ঞান যে কেবল বিশেষ কোন শাস্ে¿র ব্যাপার নয় , এটি যে এক ধরণের মননশীলতার দিক , চিন্ত্মায় স্ব"ছ এক যুক্তিবাদেরই উন্মেষ সেটি বোঝা নিতান্ত্মই প্রয়োজন । এই উপলব্ধিটা আরো জরন্নরী এই কারণে যে মাঝে মাঝে যেন মনে হয় যে বিশ্ব এক সংঘাতময় পরিবেশের দিকে ক্রমশই এগুে"ছ। এটিকে সভ্যতার সংঘাত বা ঈষধংয ড়ভ ঈরারষরুধঃরড়হ বলতে হয়ত অনেকেই চাইবেন না কিন্তু আমাদের চাওয়া না চাওয়ার তোয়ক্কা না করেই যেন ক্রমশই আমরা পুব পশ্চিমের এক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হ"ি"ছ নিজের অজান্ত্মেই। সংঘাতের এই অন্ত্মঃস্রোতের অন্ত্মরাল থেকে মাঝে মধ্যে আমরা ভাবাবেগে আপস্নুত তারন্নণ্য সম্স্নুদায়কে দেখি , যুক্তির বিরন্নদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে। বিশ্বব্যাপী মানব সভ্যতায় বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য অনুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা আমরা লড়্গ্য করি , আশঙ্কা হ"ে"ছ সেই চেষ্টা যেন ক্রমশই ড়্গীণ হয়ে আসছে। পরিহাসের ব্যাপারই মনে হয় যখন দেখি যে অর্থনীতির বিশ্বায়নের বিপরীতে , মানসিক বিভাজন সমান্ত্মরালে যেন পালস্না দিয়ে তুলেছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন নিয়ে প্রশ্ন আছে , বিতর্ক ও আছে অনেক কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানব সমাজ যে একই সুত্রে আবদ্ধ হতে পারে , অন্ত্মত তাদের মধ্যে যে একটা মোটা দাগের ঐক্য স্থাপিত হতে পারে , সে নিয়ে তো বিতর্ক ওঠার কথা নয়। বিশ্বের সকল মানুষ একই মতবাদের অনুগামী হবে সেটি কেউ আশা করছে না কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতার আপাতঃ বৈরীত্যে যেমন বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের কথা বলে গেছেন ভারতের মনিষীরা তেমনি এই তত্ত্বের বিস্ত্মৃতিতে আমরা বিশ্বেও তেমনি এক ধরণের ঐক্য সন্ধানী হতে পারি , নানাবিধ বৈচিত্র এবং বাহ্যত বৈপরীত্য সত্ত্বেও।

বৈচিত্র ও ড়্গোত্রবিশেষে বৈপরীত্য যে বিরোধের সুত্রপাত ঘটাবে সেই অনুধাবন অসভ্যতারই নামান্ত্মর। সভ্যতার দাবী মানুষের কাছে অনেক বেশী। বস্তুত কোনরকম বৈচিত্র ও বৈপরীত্য যে বিরোধের কারণ হবে না , হতে পারে না সেটির এক মাত্র রড়্গাকবচ হ"ে"ছ যুক্তি এবং মনের ভেতর থেকে সেই নৈতিক সমর্থন যে আমরা মানুষের বিরন্নদ্ধে লড়বো না। আমরা লড়তে পারি অপশাসনের বিরন্নদ্ধে , নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরন্নদ্ধে , গণতন্ত্¿ বিরোধী অপশক্তির বিরন্নদ্ধে কিন্তু মনুষত্বের বিরন্নদ্ধে নয়। আজ যেন লড়্গ্য করি মানুষই হয়ে উঠছে , মানুষের বৈরী পড়্গ। এই উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় যে যুক্তি , তা আসতে পারে মানবিক মুল্যবোধে সমৃদ্ধ শিড়্গার মাধ্যমে। বাঙালির জন্যে এ ও এক আশ্চর্য পরিহাসের বিষয় যে আমরা যে বিজ্ঞানমনস্ক মানবতাবাদী যৌক্তিক শিড়্গা ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরন্ন করেছিলাম আমাদের স্বাধীনতার ঊষালগ্নে, ড কুদরতে খোদার শিড়্গা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী , সে থেকে আমরা যোজন দুরত্ব স্থাপন করে ফেলেছি। এখন এতটাই দুরে চলে এসছি আমরা যে ভাবতেই অবাক লাগে যে বাংলাদেশের মানুষ একটি ধর্মনিরপেড়্গ বিজ্ঞানমুখী শিড়্গার দিকে যাত্রা শুরন্ন করেছিল ,

দেশটির জন্মলগ্ন থেকে। কিছু মুল্যবোধ ও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে যাঁরা ধর্মশিক্ষা চালু করেছিলেন স্কুলের প্রাথমিক পর্যায়ে , তাঁরা আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিষ বাস্প ছড়িয়ে ছিলেন সুকৌশলে। সে জন্যেই মাদ্রাসা শিক্ষিত তারম্নণ্যের কথা না হয় বাদই দিলাম , যাঁরা সাধারণ স্কুল কলেজ থেকে পড়ে বের হ'ছেন , তাঁদের অনেকের মনেও সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ এতটাই প্রবল যে তাঁরা যুক্তির ধার ঘেঁষে যান না , একেবারেই। আমার এক আত্মীয় (আত্মার সম্প্লর্ক অর্থে নয়) ক্রিকেট খেলায় পাকিস্ত্মানকে সমর্থন করার পেছনে যে যুক্তি দিয়েছিলেন , সেটির পেছনে যদি কারণ হতো কোন পাকিস্ত্মানি খেলোয়াড়ের ক্রীড়া নৈপুণ্য , তা হলে আমার বলার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁর কারণ ছিল ভিন্ন। পাকিস্ত্মান একটি ইসলামি রাষ্ট্র , অতএব সে দেশের খেলোয়াড়দের সমর্থন করাকে তিনি যেন তাঁর ধর্মীয় দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁর এই তত্ত্বের পেছনে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে সমর্থন না করার পেছনের কারণটি ও পরিষ্কার হয়ে ওঠে , যখন তিনি ভারত ও হিন্দুদের সম্প্লর্কে তাঁর বিদ্বেষপুর্ণ উক্তি প্রকাশ করেন। এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্প্লুর্ণ পৃথক। যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রকাশের জন্যে আমাদের ব্যাকুলতা , সেই বহুল উ"চারিত চেতনার পাশাপাশি পাকিস্ত্মান প্রীতি ও ভারত-ভীতি বড়োই যুক্তিহীন ও কষ্টসাধিত সমীকরণ। এর উৎপত্তি কেবল এ কারণে নয় যে ভারতীয় দাদাগিরি আমাদের বিচলিত করে , সেটি বোধ করি একটি কারণ এবং সে কারণের পেছনে যুক্তি ও থাকতে পারে কিন্তু এ কারণেও ও বটে যে মুসলমান বাঙালি যে পরিচিতি সঙ্কটের সম্মুখীন হয় , সেই সঙ্কট তাকে নিরাপত্তার অভাব বোধে আক্রান্ত্ম করে , তখন এক ধরণের হীনমন্যতা বোধ ও তার মধ্যে সম্প্লসারিত হয়। এই পরানুভুতি , যৌক্তিক ও মানবিক শিক্ষার অভাব থেকেই ঘটে থাকে। তবে এ কথা ও বলার অপেক্ষা রাখে না যে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু বাঙালিও বাংলায় সংখ্যালঘিষ্ঠতার হীনমন্যতা কাটাতে দ্রম্নত ভাষিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সেই প্রয়াসও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিরই পরিচায়ক। বিষয়টি নিয়ে বিস্ত্মারিত বিশেস্নষণের প্রয়োজন হয়ত আছে তবে সেটি বর্তমান নিবন্ধের আওতার বাইরে। কেবল এটুকু বলা জরম্নরী এ সব বিষয়ই আজকের বিশ্বায়নের মুল চেতনার পরিপন্থি। গোটা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলোরও এ কথা বোঝা অতি আবশ্যিক যে বিশ্বায়নের বিষয়টি কেবল মাত্র অর্থনৈতিক ইস্যু নয় এটি একটি রাজনৈতিক ও মানবিক ইস্যুও। এই মানবিক ও যৌক্তিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তবে এই বিশ্বমানবতার চেতনা বিকাশের সব চেয়ে বড়ো উপায় হ"ছে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা এবং যুক্তি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা। কারও বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করা যেমন অন্যায় তেমনি যুক্তির মোড়কে বিশ্বাসকে উপস্থাপন করা ও অন্যায় । সেই বিশেস্নষণ করার পুর্ণ ক্ষমতা আমাদের তারম্নণ্য শক্তি তখনই পাবে যখন তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি পাবে। সেটির জন্যে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই , যে কোন বিষয় বোঝার জন্যে একটি

বিশেস্নষণমুলক বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে বিশ্বাসের স্বর্গ সন্ধানে নয় , যুক্তিতর্কে সত্য সন্ধানে। ডারউইনের সময়ে যেমন , তেমনি আমাদের এই বৈরী সময়েও।

[এই নিবন্ধটি যুগান্তরে প্রকাশিত হয়, মুক্ত-মনায় পুনঃ মুদ্রনের জন্য লেখক কর্তৃক প্রেরিত]